বাংলাদেশ ও ইসলামী শাসন

মুস্তফা হুসাইন

বাংলাদেশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা কি প্রায় অসম্ভব? হ্যাঁ, যদি প্রজাতন্ত্রের বেঁধে দেয়া আইনকানুনের মাধ্যমে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভবই বটে। কিন্তু শারঈ, সার্বজনীন ও ঐতিহাসিক সূত্র মেনে যদি সঠিক রাজনৈতিক লাইনে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়; তবে তা (যদি আল্লাহ তা'আলা চান) অবাস্তব কল্পনা নয়। ইউনিপোলার ও বাইপোলার দুনিয়া ভেঙ্গে বিশ্বযুদ্ধপূর্ব মাল্টিপোলার দুনিয়ার বাস্তবতা যদিও আসন্ন, তবুও স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার কোনো অঞ্চলে শরীয়াহর শাসন পরাশক্তির (চাই আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক) জন্য সহনীয় হবে না, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বাংলাদেশে যদি কখনো ইসলামি শাসন কায়েম হয়, বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থা এবং ভারত ও মিয়ানমারের মতো রাষ্ট্রের সাথে সীমানা হওয়ার মতো বাস্তবতার দরুণ—এই দেশকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে, এমনটাই অনুমেয়। তবে কোনোকিছু কষ্টসাধ্য হওয়া মানেই তা অসম্ভব হওয়া না।

নিস্ক্রিয়তা ও কল্পনাবিলাসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কাছে-দূরের বৃহৎ শক্তির আগ্রাসন ও বিরোধিতার সূত্রের আলোকে অনেকেই বলে থাকেন,

'বাংলাদেশে ইসলামি শাসনের অস্তিত্ব অসম্ভব।'

এ প্রস্তাবনার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয় মূলত তিনটি কারণেঃ-

1) বহিঃশত্রুর সামরিক আগ্রাসন,

2) অর্থনৈতিক অবরোধ এবং

3) স্থানীয় দালাল সেক্যুলারদের প্রতিবিপ্লব।

?) ??????? ????????:

এ ব্যাপারে বলা হবে, সবচেয়ে উন্মাদ ভারতীয় প্রশাসনও নিজ দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুটি কাশ্মীর চাইবে না। দেশের দুই প্রান্তে দশ লাখ করে সেনা মোতায়েনের সামর্থ্য ভারতের ফেডারেল সরকারের নেই এটা স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা। ইতিমধ্যেই প্রচুর সামরিক ব্যয়ে জড়িয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে, এদেশের চরম বৈরী মানসিকতা-সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধে জড়ানো হবে অর্থনৈতিক আত্মহত্যার শামিল। আর এটাই স্বাভাবিক বুদ্ধির দাবি।

হ্যাঁ। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর খন্দকার মোশতাক সরকার বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয়ার পর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন বাংলাদেশে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছিল। এর উপর কিয়াস করে অনেকেই অনেক কথা বলে অথবা বলতে পারেন। তবে তা সঠিক ও বাস্তবসম্মত হবে না। কারণ, তখন শীতলযুদ্ধ চলমান ছিল। মোশতাক ছিল কট্টর মার্কিনপন্থী, ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট-কেন্দ্রিক পপুলিস্ট রাজনৈতিক নেতা। এছাড়াও, সে ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর সাথে আপোষে আগ্রহী। '৭১ সালেও সে আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সাথে আপোষে সম্মত ছিল।

অন্যদিকে তখনকার ভারতীয় প্রশাসন ছিল সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্ভুক্ত এবং চরম ভুট্টোবিদ্বেষী। ইসলামের স্লোগান দেয়া দুর্নীতিবাজ

ও চতুর নেতাদের উপদ্রব আমাদের ইতিহাসের একটি সাধারণ সমস্যা বলেই সময়ের ইমামগণ মনে করেন। কুটচাল, গণতন্ত্র আর গলাবাজির মাধ্যমে নেতৃত্বে আসা ব্যক্তিরা ইসলামি শাসনের আমানত বহনের মতো দৃঢ়তা রাখতে সক্ষম হয় না, হবেও না। আমরা গোলাম আযম, ঘানুশি, ইমরান খান বা মুরসির মতো ব্যক্তিদেরকে মুসলিমদের নেতৃত্বে চাই না বলেই গণতান্ত্রিক পথকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ।

বাকি, অখন্ড ভারত একটি একপ্রকার মিথের মতো, যদিও এ ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান কাম্য। আরএসএস এই মিথ ব্যাবহার করে ভারতের হিন্দুদের রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে। হিন্দুত্ববাদ তত্ত্বের প্রবক্তা সাভারকারের রচনায় সুস্পষ্টভাবে এই আলোচনা এসেছে। উল্লেখ্য, আসাম ও পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলো মুঘল আমলেও ভারতের অংশ ছিল না। ১৮২৬ এ ইয়ানদাবো চুক্তির পর ব্রিটিশরা এই রাজ্যগুলো বার্মাদের থেকে অধিগ্রহণ করে।

পরপর দুই মেয়াদ আসামে বিজেপি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও রামের জন্মভূমি বা হিন্দুত্ববাদের দাওয়াত সেখানে দেয়া হয়না। অরবিন্দ রাজখোয়া ও পরাগ দাসের মতো প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ও অনেক অহমিয়া নেতারা আসামি ও ভারতীয় জাতীয়তাকে এক করে দেখতে নারাজ। রাজনৈতিক সংহতির স্বার্থে বিজেপি নিজ দেশের ভেতরের আসাম বা কেরালাতেই যখন রামরাজ্যের বয়ান মুলতবি রাখছে, সেখানে অখন্ড ভারতের আকিদার বাস্তবায়নে তারা সরাসরি সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নাক গলাতে চাইবে কেন?

ইতিমধ্যেই কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা বা মনিপুরে আভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায়ে হিমশিম খাচ্ছে ভারত। এমতাবস্থায়, আরএসএস এর অশিক্ষিত পুরোহিতদের দাওয়াতে বিজেপি বাংলাদেশ দখল করে নিতে চাইবে—এমন চিন্তা ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার বিচারে সঠিক মনে হয় না। তবে, এটাও মাথায় রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে ভারতবিরোধী মনোভাব জিইয়ে রাখার জন্য, হিন্দুত্ববাদের ব্যাপারে প্রচারণাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, যদি তর্কের খাতিরে সামরিক আগ্রাসনের বাস্তবতা মেনেও নেয়া হয়, তা হলে সেই আগ্রাসন উপমহাদেশে মুসলিমদের চূড়ান্ত সফলতার পথ দেখাতে পারে—এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ নয়। তবে সেটা ভিন্ন আলোচনা। বাংলাদেশকে জিনজিয়াং বা আরাকানের সাথে তুলনা করা হবে নিছক নির্বুদ্ধিতা বা গোয়ার্তুমি। আর তা বহু কারণেই। এটাও অন্যত্র আলোচ্য বিষয়।

?) ?????????? ??????:

এটি বাহ্যত একটি জটিল সমীকরণ। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সুযোগ রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার, যা পেঁয়াজের ক্রাইসিসের পর দেখা গেছে। ইসলামি আন্দোলনের কেন্দ্রে অর্থনৈতিক অবরোধের অনিবার্যতা বিবেচনা করেই, নব্বই দশকে আমাদের নেতা শায়খ আবু আবদুল্লাহ ও উনার সঙ্গী-সাথীরা কৃষিপ্রধান দেশ সুদানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সময়ের প্রেক্ষিতে তৈরী পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে, কৃষিখাতকে শক্তিশালী করা একটি বিকল্প হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিস্তারিত পরিকল্পনা নেককার, জ্ঞানী ও সুদক্ষ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের থেকে আসবে আশা করি।

এছাড়া, ইসলামি শাসনের সম্মান ও নিরাপত্তার দাওয়াত মুসলিম জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক করা জরুরী। যার ফলে কানায়াত, ইহতিসাব ও অল্পে তুষ্টির মাধ্যমে বস্তুবাদী চিন্তাধারার কবর খননের পথ ধরে সুসংহত আভ্যন্তরীণ কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

?) ?????????? ???????????:

এ সংকটের বিপরীতে করণীয় কী, তা উম্মাহর জ্ঞানী ব্যক্তিরা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তা হল, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে চলমান ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকল্প নেতৃত্ব ও যোগ্য ক্যাডার প্রস্তুত করে ফেলা। অর্থাৎ, আগেকার সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিকল্প নেতৃত্ব প্রস্তুত করে ফেলা। যা সম্ভব হবে সঠিক আকিদা-মানহাজের উপর আপোষহীন, ধারাবাহিক দাওয়াত ও তেহরিক পরিচালনার মাধ্যমে। তথাকথিত ডানপন্থী 'ইসলামপ্রেমী'

ছদ্মসেক্যুলার গোষ্ঠী ও স্বঘোষিত সেক্যুলার শিবিরের পাশাপাশি, সেক্যুলারদের সাথে মুহূর্তে আপসে রাজি, এমন প্রত্যেককেই ইসলামি শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে দূরে রাখাই হবে এক্ষেত্রে সমাধান।

হ্যাঁ, অর্থের বিনিময়ে ভূমি অফিসের কেরানী কিংবা বিদ্যুতের লাইনম্যানের কাজে তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে। এতে সমস্যা নাই।

পরিশেষে বলতে হয়—অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতটুকু তা আল্লাহই ভালো জানেন এবং সময়ই তার উত্তর দিবে। তবে, আমাদের করণীয় হিসেবে বলতেই হয় যে, সামগ্রিকভাবে সঠিক আকিদা, মানহাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ ধারণ করা সবার আগে জরুরী। এবং বাংলাদেশে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সর্বত্র ব্যাপক দাওয়াত ও মেহনতের মাধ্যমে, এ বিষয়গুলো স্পষ্ট করাই হল প্রাথমিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব।

চূড়ান্ত ফলাফল চাক্ষুষ দেখে যাওয়া আমাদের জন্য জরুরী না। আমরা সঠিক পথের উপর থেকে জীবন শেষ করতে পারলাম কি না, সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা আমরা করতে পারলাম কি না, সেটাই মূল বিষয়।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

> “আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফিক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।” (সূরা হুদ, ১১:৮৮)

[২]

এখন যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই আসে, তা হলো— রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসন পরিচালনার সংকটের সমাধান কী? কাফির-মুরতাদ চক্রকে হটিয়ে তালিবানদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শান্তিপূর্ণ ও আপোষকামীপন্থার অসারতা প্রমাণের পরও, কিছু মহল থেকে অজ্ঞতাবশত এমন প্রশ্ন ওঠা এখনো স্বাভাবিক। আত্মত্যাগ ও প্রবল মেহনতের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও, রাষ্ট্রীয়প্রশাসন পরিচালনা ঈমানদারদের দ্বারা সম্ভব নাও হতে পারে। যেহেতু পঞ্চাশ বছর ধরে সেক্যুলারদের দ্বারাই তা হয়ে আসছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রে ইসলামপন্থীদের অবস্থান ও অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে।

আসলে, এটা বহুপ্রাচীন ও বহুল আলোচিত একটি সংশয়, যার জন্ম হয়েছে ইখওয়ানি চিন্তার জঠরে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের শায়খ আবু বকর নাজি ‘ইদারাতুত তাওয়াহহুশ’ কিতাবে এ নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন দেড় যুগ আগেই। হানাদারদের অপসারণের পর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস মুজাহিদিন কিভাবে করবেন, শারঈ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার মূলনীতির আলোকে তা শায়খ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

> “যখন মুরতাদ গোষ্ঠীকে অপসারণ করে আমরা কোন অঞ্চল বা ভূমি আয়ত্বে আনতে পারব, আমরা দেখতে পাবো প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মত লোকের যথেষ্ট অভাব আমাদের রয়েছে। যদিও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবস্থাপনা/management এর দক্ষতা অনেকেরই থাকবে, তবুও তা প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট হবে না। যেহেতু, আমরা সংখ্যায় অপ্রতুল থাকবো তাই আমাদেরকে সদ্য প্রশাসন-শূণ্য অরাজক অঞ্চলের বাসিন্দাদের দিয়েই প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতে হবে, এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেরই অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই, আমরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো ইন শা আল্লাহ।
>
> বাস্তবিক অর্থে, আমরা এমন এক সমাজ বাস্তবতায় বসবাস করছি যে, নৈরাশ্যবোধ আর সংশয় খুব সহজেই আমাদের জেঁকে ধরে। যার ফলে নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপ্রিয় এবং কোন প্রকার বালা-মুসিবত মুক্ত বিষয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়—যা থেকে কেউই মুক্ত নয়। এক ভাই একবার আমাকে বলেন—“এভাবে (জিহাদের মাধ্যমে) আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। যদি আমরা এই মুহূর্তে শাসনব্যবস্থা অপসারণ করেও ফেলি, কে বা কারা কৃষি, বাণিজ্য বা অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবে?” আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, “আবু সুফিয়ান,

ইকরিমা এবং তাদের মত অন্যরা।”

কিন্তু পরিপূর্ণ উত্তর হল—জিহাদ বা যুদ্ধের প্রকৃতির ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ বুঝ থেকেই মূলতঃ এই জাতীয় প্রশ্নের জন্ম হয়। কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোলাটে ধারণা থাকার কারণেও এমনটা হয়ে থাকে।

নিঃসন্দেহে নেতৃত্ব হঠাৎ করে সৃষ্টি হওয়ার মত বিষয় না। রক্ত, ঘাম আর লাশের কঠিন ও দীর্ঘ সফরের সাথে সাথেই নেতাদের আবির্ভাব ঘটে।

দ্বিতীয়ত, মুজাহিদিনদের জামাআতের জন্য কৃষি, বাণিজ্য অর্থনীতির উপর বিশেষ জ্ঞান দক্ষতা থাকা কোন পূর্বশর্ত নয়। কেউ যদি বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসা বিপ্লবী বা রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে মনোযোগের সাথে মনোনিবেশ করে, তবে দেখতে পাবে – তারা রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব নিজ দলের লোকদের দিয়ে থাকে। যারা দলের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কিছু নীতিমালা বা পলিসি প্রয়োগ করে থাকে, আর মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক খুঁটিনাটি কাজের জন্য বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আমলা-গোমস্তা নিয়োজিত থাকে। নীতি বা পলিসি নিয়ে যাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। যারা দলীয় সদস্যও না।

এ বিষয়ে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনেক সময় প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, আমাদের কাছে এর চেয়েও উত্তম সমাধান রয়েছে। আর তা হল, আমরা মানুষের সাথে মিশবো, তাদের কাছাকাছি যাবো। বেতন-ভাতা নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের কাজে লাগাবো, পাশাপাশি তাদের সাথে আমাদের লোকেরাও বিঘ্ন সৃষ্টি না করে কাজ করলো ও শিখলো।

আমাদেরকে অবশ্যই আয়ত্ব করতে হবে ধৈর্য ও সহনশীলতা, আত্মত্যাগ, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা, কুরবানী, ন্যায়বিচার, সদাচরণের গুণাবলী। যদি উম্মতকে সাথে নিয়ে আমরা চলতে চাই এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হতে চাই, তাহলে এগুলো সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর। যে কোন সমাজে মজলুম বা দুর্বলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই তাদের কাছে আমরা এ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো যে, আমরা পূর্ববর্তী সমস্যাগুলো দূর করব। আমরা প্রত্যেকে প্রমাণসহ আগমনকারী দুর্বলের হয়ে হক আদায় করে দিব, একই সাথে তাকে ও ক্ষমাশীল হওয়ার ব্যাপারে নসিহত করবো, যদিও তার হক আদায়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করব এবং দুর্বলকে রক্ষা করব। আমরা তাদের বলব, “আমাদের আদর্শ হচ্ছে আপনাদের অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীর (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য যথাসম্ভব কুরবানী করা।”

আমরা শক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা মহানুভবতাকে আঁকড়ে ধরব। এটা ঠিক যে, আমরা ভয়াবহ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বো। আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ হতে, মুনাফিকদের পক্ষ হতে—যারা আমাদের কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে আশ্চর্যজনক অনেক বিষয়ও আমরা দেখতে পাবো। যখন ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে তখন তা অবিশ্বাস্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে। যখন মানুষ সাহসিকতা, নিশ্চয়তা, উত্তম গুণাবলী, বিশ্বস্ততা, ইকরাম, সহযোগিতা, নমনীয়তা ও বিনয়ের মত মহান বিষয়গুলো চোখে দেখবে তখন উপস্থিত কঠিন চ্যালেঞ্জ ও আতঙ্ক তাদের চোখে ক্ষুদ্র হয়ে দেখা দিবে। ওয়াল্লাহি, যখন এমন পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হবে আশপাশের অঞ্চল থেকে বহু যুবককে আমরা আসতে দেখব; যারা নিজ মেধা, দক্ষতা আর শ্রম দ্বারা আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের অবশ্যই সকল শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। কীভাবে কার সাথে চলতে হবে—তার উপর সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

যদি তারা “যাত আনওয়াত” এর দাবি করে আমরা কী করব? তাদের কোনো পাপের শাস্তি বা প্রতিবিধান কি হবে; যেমন—মদ পান। কখন আমরা শাস্তি দিব, কিংবা কতটুকু? কখন আমরা ছাড় দিব? কখন আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করব? ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্যই সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম (রাহিঃ) বলেন, “এই যুদ্ধ ইসলামের সন্তানদের জন্য সকল স্তরের মানুষের সাথে উঠাবসা করার বিষয়টি সহজ করে

দিয়েছে।”[1]

আলহামদুলিল্লাহ আমরা বারবারই নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের প্রস্তাবিত মানহাজ তথা দাওয়াহ, ইদাদ, সংগঠন ও সামরিকায়নের সমন্বয়ে শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে পরাস্ত করার মাধ্যমে তামকিন অর্জন করার মানহাজ শারঈ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ও স্বতঃসিদ্ধ। এবং এই প্রস্তাবনা কোনো অগভীর চিন্তার ফসলও নয়।

আলহামদুলিল্লাহ। সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা বাস্তবায়নের পরও যারা ফিতনার ছিদ্র তালাশে ব্যস্ত, যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা তার একনিষ্ঠ বান্দা মুজাহিদিনদের সাহায্য করবেন না, তাদের উচিত এই আয়াতটি নিয়ে একটু তাদাব্বুর করা-

مَنۡ كَانَ يَظُنُّ اَنۡ لَّنۡ يَّنۡصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنۡيَا وَ الۡاٰخِرَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لۡيَقۡطَعۡ فَلۡيَنۡظُرۡ هَلۡ يُذۡهِبَنَّ كَيۡدُهٗ مَا يَغِيۡظُ

“যে কেউ মনে করে, আল্লাহ্ তাকে কখনোই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রশি বিলম্বিত করার পর কেটে দিক, তারপর দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না।” (সূরা হাজ্জ, ২২:১৫)

---

[1] ইদারাতুত তাওয়াহহুশ, ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ